ঈশ্বর কি শেষ পর্যবেক্ষক

Dr. Dipak Ghosh

Eminent Physicist, CV Raman Award Winner. Emeritus Professor, Sir C V RAMAN Centre for Physics and Music Jadavpur University,
Author of numerous books on Physics, popular science and philosophy in English and Bengali

পরমাণুর হাড়ির খবর অনেকটা জানা হয়ে গিয়েছে – কী কী কণা দিয়ে পরমাণু তৈরি তাদের মেলামেশা কী নিয়মেই বা হয়? সহজে বলতে গেলে, পরমাণুর ভিতরে একেবারে কেন্দ্রে থাকে প্রোটন, নিউট্রন, চারপাশে ঘোরে ইলেকট্রন। আসল তথ্য হল প্রোটন, নিউট্রনও তৈরি হয়েছে কোআর্ক এবং গ্লুঅন কণা দিয়ে। এদের কার্যকলাপ নিউটনের ধ্রুপদী বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা

করা যায় না। এইসব ছোট ছোট কণাদের গতিবিধি এবং কার্যকলাপ ব্যাখ্যা করার জন্যে নতুন ধরনের তত্ত্ব তৈরি হল। এই তত্ত্বের একটা মূল কথা হল, আমরা যাদের এতদিন কণা বলে (যেমন — প্রোটন, নিউট্রন, ইলেকট্রন) ভেবে এসেছি, তাদের তরঙ্গ হিসাবেও ভাবা যায়। যেমন, আলোর তরঙ্গ। আবার উল্টোটাও ভাবতে পারি যে, আলোর তরঙ্গেও একটা কণা ধর্ম আছে। সাধারণভাবে মেনে নেওয়া কঠিন হলেও বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে প্রমাণ পেয়েছেন। ইলেকট্রন, প্রোটন ঢেউয়ের মতো ঘুরে বেড়ায় আবার আলোর ঢেউও মাঝে মাঝে ব্যবহার করে কণার মতো।

ছোটো ছোটো কণারা ঢেউয়ের মতো ব্যবহার করছে বলে নিউটনের গতিবিদ্যার বদলে তৈরি হল ঢেউ গতিবিদ্যা। আরো নির্দিষ্টভাবে একে কোয়ান্টাম গতিবিদ্যা বলা যেতে পারে। এই গতিবিদ্যার গাণিতিক নিয়মকানুনগুলি অত্যন্ত সার্থকভাবে প্রমাণিত হল। এর ফলে তেজস্ক্রিয়তা কিংবা আলোর বর্ণালী থেকে শুরু করে সেমিকন্ডাকটার — সবই ব্যাখ্যা করা গেল। কিন্তু এই গাণিতিক নিয়মকানুনগুলির পিছনে কোনো সুদৃঢ় ভিত্তি আছে কি না — সে নিয়ে আছে বিতর্ক। আইনস্টাইন কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার ভিত্তি নিয়েই প্রশ্ন তুলেছিলেন।

এই সার্থক কোয়ান্টাম গতিবিদ্যা সম্বন্ধে বিজ্ঞানী সেই ফেইনম্যানসের মত ছিল যে, বেশিরভাগ বিজ্ঞানীই এই গতিবিদ্যা কাজে লাগালেও তার মানে বোঝেন না। একজন বিশিষ্ট কণা পদার্থবিদ, পরিণত বয়সে গবেষণা ছেড়ে পাদরি হয়েছিলেন এই আক্ষেপে বেশিরভাগ কোয়ান্টাম গতিতত্ত্ববিদদের (Quantum mechanie) দার্শনিক মান গাড়ির মিস্তিরিদের (Motor mechanic) থেকেও কম।

বিখ্যাত কোয়ান্টাম তত্ত্ববিদ শ্রয়ডিংগার এক মজার উদাহরণ দিয়েছেন। ধরা যাক, একটা বাক্সের মধ্যে রাখা হল একটা বিড়াল আর বিষাক্ত গ্যাস ভর্তি একটি বোতল। এবার ওই বিষাক্ত বোতলের সঙ্গে গাইগার কাউন্টার, মানে যে যন্ত্রটি ইউরোনিয়াম পাথর থেকে বেরনো তেজস্ক্রিয় রশ্মি শনাক্ত করতে পারে, জুড়ে দেওয়া হল। আর যদি একটি ইউরেনিয়াম পরমাণু থেকে তেজস্ক্রিয় রশ্মি বেরিয়ে গাইগার কাউন্টারটিকে সক্রিয় করে তাহলে বোতলটার বিষাক্ত গ্যাস বিড়ালটাকে মেরে ফেলবে।

কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী ঠিক কোন মুহূর্তে তেজস্ক্রিয় রশ্মি বেরবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। সে জন্য এই তত্ত্বে ভাবা হয় একটি ইউরেনিয়াম পরমাণু দুটি অবস্থার মিশ্রণ। একটি অবস্থার ইউরেনিয়াম পরমাণু নিষ্ক্রিয়, অপর অবস্থায় সক্রিয়। মানে পরমাণু ভেঙে তৈরি হয়েছে অন্য পরমাণু।

সব মিলিয়ে আমাদের ধরে নিতে হবে বিড়ালটা যে অবস্থায় আছে সেটি জীবিত ও মৃত — এই দুই অবস্থায় সমান উপরিপাত। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই অবস্থা কোনোভাবেই

আধমরা-আধ-বাঁচা নয়। একেবারে মরা বা বাঁচার উপরিপাত। অর্থাৎ দুটো অস্তিত্বই একই সঙ্গে বর্তমান। রোজকার জীবনে এমন অবস্থা আমরা কল্পানাও করতে পারি না। কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী বাক্সটি খুলে দেখার প্রক্রিয়াই ঠিক করবে বিড়ালটা জীবিত না মৃত।

মজা করে ভাবা যেতে পারে খুলে দেখার কৌতুহলটি বিড়ালটিকে মেরে ফেলছে, মানে এই ঘটনার বিবরণে পর্যবেক্ষণের ভূমিকা আসল। আর মজার কথা, কোনো বস্তুই কোনো বিশেষ অবস্থায় থাকে না (যেমন জীবিত না মৃত) যতক্ষণ না বস্তুদের পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। জঙ্গলে একটা প্রকাণ্ড গাছ পড়লে কী শব্দ হবে, যদি শোনারই কেউ না থাকে? অষ্টাদশ শতাব্দীর দার্শনিকরা যেমন বিশপ বার্কলে এবং সলিপসিস্টরা বলবেন — না, কোনো শব্দ হবে না।

সলিপসিস্টদের কাছে জীবন একটা স্বপ্ন, যে স্বপ্ন দেখে, তার কাছেই একমাত্র বাস্তব অস্তিত্ব। একটি টেবিল তখনই থাকবে যখন একটি চৈতন্য সেটিকে পর্যবেক্ষম করার জন্য থাকে। দার্শনিক দেকার্ত-এর কথায় — আমি ভাবি তাই আমি আছি। এই কথাটি সলিপসিস্টদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। গ্যালিলিও, নিউটন-এর আমল থেকে বিজ্ঞানের সব বড় অগ্রগতি ধরে নিয়েছে — গাছ পড়লেই শব্দ হবে, পদার্থবিদ্যার আইনগুলি দ্রষ্টা নিরপেক্ষ, দ্রষ্টা সাপেক্ষ নয়। অন্যদিকে কোয়ান্টম তত্ত্ববিদরা — যাঁদের গাণিতিক নিয়মকানুন অত্যন্ত সার্থক বলে প্রমাণিত হয়েছে, তাঁদের ভাবনাটি এইরকম — কোনো পর্যবেক্ষক না হলে বাস্তবের কোনো অস্তিত্বই নেই।

আরো সহজভাবে বলতে গেলে পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়াই বাস্তবকে তৈরি করে। আবার কোয়ান্টাম তত্ত্ববিদ্‌রা ভাবেন ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি (বিগ ব্যাং) কোয়ান্টম দোলাচলতার থেকে। যে বিতর্কের আলোচনা করা হল আজকের দিনে অন্যরকম 'ভাবনা পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যায়। যদিও বিজ্ঞানীরা বিড়ালকে একই সঙ্গে জীবিত ও মৃত করতে পারবে না, কিন্তু ন্যানো টেকনোলজির সাহায্যে আলাদা আলাদা পরমাণুকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। এই ধরনের পরীক্ষা হচ্ছে ষাটটি কার্বন পরমাণুর তৈরি Bucky ball দিয়ে। বিজানীরা এমনও পরীক্ষার কথা ভাবছেন, হাজার হাজার পরমাণুর তৈরি ভাইরাস একই সময়ে দু'জায়গায় থাকতে পারে কিনা? আবার অধুনা বহু আলোচিত এবং বিতর্কিত সুপারস্ট্রিং তত্ত্ব থেকে শ্রোয়াডিংগারের বিড়াল পরীক্ষা ব্যাখ্যার চেষ্টা চলছে।

বিজ্ঞানীরা ভাবছেন অনেক সমান্তরাল বিশ্বের অস্তিত্বের কথা। সেই ভাবনায় শ্রয়ডিংগারের বিড়ালের পরীক্ষাটাকে ভাবা হচ্ছে যে, শ্রয়ডিংগারের বেড়ালটি বেঁচে এবং মরে একই সঙ্গে আছে এবং এটা সম্ভব হয়েছে কারণ ব্রহ্মাণ্ড দুভাবে ভাগ হয়ে গিয়েছে একটি ব্রহ্মাণ্ডে বেঁচে আছে, আরেকটি ব্রহ্মাণ্ডে মৃত। এভাবে ভাবা রোজকার জীবনের নিরিখে কষ্টকর। এইভাবে ভাবলে বিশ্বের জন্ম হয়েছিল তখনই যখন কোনো পর্যবেক্ষক (সচেতন ব্যক্তি) প্রথমবার কোনো পরিমাণ করেছিলেন।

বলা হয় কোয়ান্টাম তত্ত্ব খুব ছোটো ছোটো বস্তুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বিজ্ঞানীরা ভবছিলেন ছোটর সীমানা ছাড়িয়ে কোয়ান্টাম তত্ত্ব বড় মাপের বস্তুকেও ধরে ফেলবে ববে। আগেই বলেছি, এমন একটা পরীক্ষা করা হয়েছে দেখা গেল তুলনায় বড় বস্তুর বেলায়ও কোয়ান্টাম তত্ত্ব সফল। যে সূত্র ধরে এই পরীক্ষা করা হয়েছে তার কৃতিত্ব একজন ভারতীয় বিজ্ঞানী অনুপম গর্গের । এঁর সঙ্গে ছিলেন নোবেল জয়ী অ্যান্টনি লেগেট। পঁচিশ বছর আগেই তাঁরা এ তত্ত্ব খাড়া করেছিলেন। এই তত্ত্ব ও পরীক্ষাটি খুবই জটিল।

২০১০-এর একদম শেষ দিকে বিজ্ঞানী প্যালিসস লেলয় এবং সতীর্থরা দেখালেন 'বড়' বস্তুর জগতেও কোয়ান্টম বলবিদ্যার প্রভুত্ব। এখানে বড় মানে ১ মিলিমিটারের ১০০০ ভাগের এক ভাগ। বিজ্ঞানের পরিভাষায়, খুব ছোটো একটি বস্তু, ট্রানস্‌মন আসলে তৈরি করা হয়েছে দুটো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অতি পরিবাহী টুকরো দিয়ে। এই ট্রানস্‌মনকে কাজে লাগিয়ে সূক্ষ্ম মাপজোক করে দেখা গিয়েছে কোয়ান্টাম বলবিদ্যাও এখানে কার্যকরী। অর্থাৎ 'বড়' বস্তুর ক্ষেত্রেও কোয়ান্টাম বলবিদ্যা কার্যকরী — সহজ কথায় 'বড় মাপের বস্তুর' ক্ষেত্রেও পর্যবেক্ষকের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বলে রাখা ভালো, ভবিষ্যতের কম্পিউটার এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা এই ধরনের অতি পরিবাহী দিয়ে তৈরি ট্রানসমানকে কাজে লাগিয়েই হবে।

এই পরীক্ষাটাই যেন রবীন্দ্রনাথের মনের কথা আমি না দেখলে চাঁদও নেই। রবীন্দ্রনাথের কথায় —

আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ
চুনি উঠল রাঙা হয়ে
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম
সুন্দর সুন্দর হল সে।

এখানে লক্ষ করার মতো শব্দগুলি 'হল', 'উঠল', 'হল'। সবকটাই চেতনার সঙ্গে যুক্ত। অনেকে হয়তো বলবেন বিজ্ঞানের এই পরীক্ষাটি যা রবীন্দ্রনাথকে জেতাল সে বস্তুটি মানুষেরই সৃষ্টি — চাঁদের সঙ্গে তুলনা করলে হবে না।

আগে আমরা শ্রয়ডিঙ্গারের বেড়ালের কথা বলেছি। এটাও বলেছি, কোনো পর্যবেক্ষক না হলে বাস্তবের কোনো অস্তিত্বই নেই। একটু ভেবে দেখলে এর মজাটা পাওয়া যাবে। কোনো বস্তুর অস্তিত্ব যদি পর্যবেক্ষকের ওপর নির্ভর করে তাহলে ঐ পর্যবেক্ষকের ওপর। দ্বিতীয় পর্যবেক্ষকের অস্তিত্ব আবার নির্ভর করবে তৃতীয় পর্যবেক্ষকের ওপর। এটা চলতেই থাকবে আর পর্যবেক্ষকের সংখ্যা হয়ে অনন্ত। প্রত্যেকেই আগের পর্যবেক্ষককে দেখবে। এবার যেটা জানা নেই — শেষ পর্যবেক্ষক কে হবে।